কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ৫ ...

প্রাথমিকে প্রকল্পের পর প্রকল্প, সাফল্য অধরা

শরীফুল আলম সুমন

প্রাথমিক শিক্ষা খাতে একের পর এক প্রকল্প নেওয়া হলেও বাস্তবে সাফল্যের দেখা মিলছে না। সব কাজই মাঝপথে থেমে থাকছে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে গৃহীত প্রাথমিক শিক্ষা পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা এবং স্কুল ফিডিং কর্মসূচিও থেমে আছে। কখন কিভাবে এ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবে তা নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত পাঁচ বছরে একের পর এক সিদ্ধান্ত নিলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। সর্বশেষ ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে এ শিক্ষা চালুর ডেডলাইন নির্ধারণ করা হলেও প্রতিটি উপজেলায় একটি মডেল বিদ্যালয়েই তা আটকে আছে। অন্যান্য বিদ্যালয়ে সম্প্রসারণ করা যায়নি। আর স্কুল ফিডিংয়ের অবস্থা আরো ভয়াবহ। প্রতি উপজেলার একটি করে বিদ্যালয়েও এ কর্মসূচি চালু হয়নি। এ অবস্থায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত সরকার একযোগে প্রায় ২৬ হাজার রেজিস্টার্ড, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত, কমিউনিটি ও এনজিও পরিচালিত বিদ্যালয় জাতীয়করণ করলেও এক বছরের বেশি সময়েও প্রায় এক লাখ চার হাজার শিক্ষক সেই সিদ্ধান্তের আওতায় বেতন পাননি। অথচ ইতিমধ্যে এসব শিক্ষকের বেতন গ্রেড নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয় প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। শিক্ষকরাও শিগগিরই নির্ধারিত গ্রেডে বেতন পাওয়ার আশায় আছেন। আর দেড় বছর ধরে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষককে পুলভুক্ত হিসেবে চাকরি চূড়ান্ত করলেও এখনো তাঁদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষক দুশ্চিন্তায় সময় পার করছেন।

শিক্ষাবিদদের মতে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে অনেক শিক্ষার্থীই বিদ্যালয় ছেড়ে দেয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হলে তারা অন্তত সে পর্যন্ত পড়বে। এরপর আর দুই বছর পড়লেই যেহেতু মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা, তাই কষ্ট করে হলেও তারা এ পরীক্ষায় অংশ নেবে। এমন বিবেচনা থেকেই ২০১০ সালে প্রণীত শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সুপারিশ করা হয়। তবে বিষয়টি এখনো

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

প্রাথমিকে প্রকল্পের পর প্রকল্প

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সীমাবদ্ধ আছে মন্ত্রণালয়ের কমিটি ও উপকমিটির সভার মধ্যেই। এসব কমিটি প্রথমে ২০১২ সালে এ শিক্ষা চালুর সিদ্ধান্ত নিলেও আবার তা চলে যায় ২০১৩ সালে। এরপর আর নতুন তারিখই নির্ধারণ করা হয়নি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও মেরামত, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সুরাহা, শিক্ষার্থী স্থানান্তর প্রক্রিয়া; বিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়, আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়া বর্তমানে প্রচলিত নিম্ন মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয় একীভূত হলে শিক্ষকদের সমন্বয় করা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় দুই ধরনের শিক্ষক একই প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকলে উভয়ের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ফলে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের কী হবে? তাঁরা কি চাকরিচ্যুত হবেন, না প্রাথমিক স্তরে যুক্ত হবেন তা নিয়েও কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। তবে বছরভিত্তিক একটি করে নতুন শ্রেণী করে অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করা বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংখ্যা হবে ১২ জন। এর মধ্যে ছয়জন হবেন মহিলা। কিন্তু এ সিদ্ধান্তেই এখনো আটকে আছে পুরো বিষয়টি।

প্রাথমিকের সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) নেওয়ার জন্য আলাদা বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত হলেও গত পাঁচ বছরেও তা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এ পরীক্ষা নিতে বেশ বিপাকেই রয়েছে বলে জানা যায়। অথচ বোর্ড ছাড়া সুষ্ঠু পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় বলে অভিমত শিক্ষাবিদদের।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সাক্ষরতা কর্মসূচিও মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, এ হার প্রায় ৫৯ শতাংশ আর বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের মতে, দেশে সাক্ষরতার হার ৫০ শতাংশের ওপরে। তবে সরকার এ হার দাবি করছে ৭০ শতাংশের ওপরে। এমন অবস্থায় সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে শতভাগ মানুষকে স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করার ঘোষণা দিলেও বিশেষজ্ঞদের মতে তা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী, পিএলসিএইচডি-২ এবং হার্ড টু রিচ নামে তাদের বড় দুটি প্রকল্পের কাজই গত বছর শেষ হয়েছে। বর্তমানে তাদের কয়েকটি ছোট কর্মসূচি রয়েছে। এ ছাড়া প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন, ফেইজ-২-এর আওতায় আনন্দ স্কুলের মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যদিও এ প্রকল্প নিয়ে সারা দেশে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। অভিযোগ আছে, এ আনন্দ স্কুলের বেশির ভাগই নামমাত্র। অনেক স্কুলের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া দায়।

এ ছাড়া মাঠপর্যায়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের দাবি, অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে নাম লেখায় কিন্তু স্কুলে যায় না। সরকার শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত দাবি করলেও এ তথ্য সঠিক নয়। সরকার প্রতিবন্ধীদের বাদ দিয়ে এ সংখ্যা হিসাব করেছে। এ ছাড়া চরাঞ্চলে ২০ ভাগেরও বেশি শিশু স্কুলে ভর্তি হয় না। এ সংখ্যাও বিবেচনায় আনা উচিত।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'উপানুষ্ঠানিক ব্যুরোর সব কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক। প্রকল্প শেষ হয়ে গেলে আবার দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। রাতের বেলা পুরুষরা পড়ালেখা করতে ঠিকমতো আসতে চায় না। মহিলারা তো আসেই না। সারা দিন কাজ করে তারা আসবেই বা কিভাবে। ভর্তির সময়ের নাম দেখে যদি সাক্ষরতার হার নির্ণয় করা হয় তাহলে তা সঠিক হবে না। আর প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার কমাতে এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।'